যুগান্তর

তারিখ 19 MAR 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভিসি ও শিক্ষক নিয়োগে এখনও

খোলা জানালা

তারেক শামসুর রেহমান

সাম্প্রতিক সময়ে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো নিয়ে যেসব সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে, তা কোন আশার কথা বলে না। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগে দুর্নীতির সংবাদ ছাপা হলেও ভিসি বহাল তবিয়তে এখনও আছেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়টিকে একটি পারিবারিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করলে শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়েছিলেন। পরিণামে তাদের ছাত্রলীগের এপিএস সন্ত্রাসের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কুষ্টিয়ায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পিটিয়েছিল ছাত্রলীগের কর্মীরা। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আমাদের প্রত্যাশা অনেক। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিণত হয়েছে অনিয়মের আখড়ায়। উপাচার্য মেসবাহউদ্দিনের মেয়াদ শেষ হওয়ায় নতুন ভিসি নিয়োগের প্রক্রিয়া চলছে এখন। ভিসি হিসেবে মেসবাহউদ্দিন শুধু দলীয় বিবেচনায় মাত্র দেড় বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা নিয়ে অনেক শিক্ষকদের অধ্যাপক পদে পদোন্নতি দিয়েছিলেন। যেখানে গবেষণামূলক প্রবন্ধের দরকার, সেখানে তার কোন তোয়াক্কা করেননি ভিসি মহোদয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে যারা অধ্যাপক হয়েছেন, তাদের প্রকাশনা না থাকলেও আমার ছাত্র যারা প্রভাষক হিসেবে ওই বিভাগে যোগ দিয়েছেন, তাদের গ্রন্থ ও গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে। সবচেয়ে অবাক করা কথা— মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র দু'দিন আগে মেসবাহউদ্দিন জগন্নাথে ১১৪ জন চতুর্থ ও তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীকে পদোন্নতি ও স্থায়ী নিয়োগ দিয়ে গেছেন। এসব ক্ষেত্রে আর্থিক সুবিধা নেয়ার অভিযোগও উঠেছে তার বিরুদ্ধে (সকালের খবর, ২৭ ফেব্রুয়ারি)।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় অনেক পুরনো বিশ্ববিদ্যালয়। সদ্যবিদায়ী ভিসি সেখানে নিয়োগ-বাণিজ্য করে গেছেন। প্রতিসপ্তাহে বিভিন্ন নিয়োগে ২০০ জন শিক্ষকের বিপরীতে তিনি দলীয় বিবেচনায় নিয়োগ দিয়েছেন ৩৫০ জনকে, যাদের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের কোন অনুমতি ছিল না। আর সর্বশেষ ২০ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৪৭তম সিন্ডিকেটে তৃতীয় শ্রেণীর ১৪৫টি পদের বিপরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে ১৮৪ জনকে। এ নিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন একজন শিক্ষক ১ মার্চের যুগান্তরের উপসম্পাদকীয় পাতায়। সবচেয়ে অবাক করা একটি কাণ্ড করেছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। এ সংক্রান্ত একটি সংবাদ ছাপা হওয়ায় আমি লজ্জিত ও দুঃখিত। আমার সব আস্থার জায়গাটা নষ্ট হয়ে যায়। তার কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক মান বাড়াবেন, এ প্রত্যাশা ছিল আমাদের সবার। কিন্তু যখন সংবাদপত্রের দিকে তাকাই, তখন আমি আশাহত হই।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে সংবাদটি ছাপা হয়েছে ২ ফেব্রুয়ারি একটি জাতীয় দৈনিকের পাতায়। এতে বলা হয়েছে, যিনি কোনদিন গণযোগাযোগ বিষয়ে পড়াশোনা করেননি, তাকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালিজম অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক পদে নিয়োগের সুপারিশ করেছে নির্বাচন কমিটি। সিন্ডিকেট তার এই সুপারিশ অনুমোদন করেনি এখন অবধি। বাতিলও হয়নি। এ সুপারিশের খবর পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হলে তা শিক্ষকদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে এবং একপর্যায়ে শিক্ষক সমিতি ভিসিকে আলটিমেটাম দেয়। মজার ব্যাপার হল, ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর হোসেন, যাকে ওই পদে সুপারিশ করা হয়েছিল, তিনি অনার্স ও মাস্টার্স করেছেন ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগ থেকে। তবে গণযোগাযোগে তিনি একটি পিএইচডি করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। মাস্টার্সে তার একটি তৃতীয় শ্রেণীও রয়েছে। তিনি বর্তমানে সরকারের তথ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত প্রধান তথ্য অফিসার ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সদস্য।

একজন সরকারি কর্মকর্তাকে সহযোগী অধ্যাপক পদে সুপারিশের বিষয়টি নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। প্রথমত, অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন এই নির্বাচনী কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করেন। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সভায় তিনি কী করে এমন এক ব্যক্তিকে সহযোগী অধ্যাপক পদে সুপারিশ করলেন, যিনি আদৌ কোনদিন জার্নালিজম বা মিডিয়া নিয়ে পড়াশোনা করেননি। অধ্যাপক হোসেন তো আমাদের শুনিয়েছিলেন, তিনি জাহাঙ্গীরনগরকে স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে চান। আমি কিছুটা বিভ্রান্ত এই ভেবে যে, এটা তিনি কেন করলেন? দ্বিতীয়ত, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩৮তম সিন্ডিকেটে (১৯৮৯) শিক্ষকদের পদোন্নতি তথা আপগ্রেডিং চূড়ান্ত করা হয়েছিল। তাতে (২ক) স্পষ্ট বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহকারী অধ্যাপক পদে ৪ বছরের অভিজ্ঞতা ও ৩টি প্রকাশনা (পিএইচডি ডিগ্রিধারীদের ক্ষেত্রে) বাঞ্ছনীয়। তবে গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে তার প্রয়োজন ৭ বছরের অভিজ্ঞতা ও ৩টি প্রকাশনা। অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে একমত হবেন যে, তথ্য অধিদফতর কোন গবেষণা প্রতিষ্ঠান নয় এবং তার আদৌ কোন গবেষণামূলক প্রবন্ধ নেই। তাহলে তিনি সুপারিশকৃত হলেন কিভাবে? তৃতীয়ত, অভিযোগ উঠেছে, ড. জাহাঙ্গীর ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন এবং সিন্ডিকেট সদস্য হিসেবে ভিসিকে প্রভাবিত করেছেন। এটা যদি সত্য হয়ে থাকে, তাহলে তিনি অন্যায় করেছেন। চতুর্থত, এই সুপারিশটি করে ভিসি মহোদয় যদি অভিযুক্ত হয়ে থাকেন, তাহলে নির্বাচন কমিটির সদস্যরাও একই অভিযোগে অভিযুক্ত। তারাও সমান দোষী। পঞ্চমত, নিয়োগটি নতুন। এখানে সিনিয়র শিক্ষকের অভাব রয়েছে। সেই বিবেচনায় ভিসি সিনিয়র শিক্ষক নিয়োগ দিতে চেয়েছেন। এজন্য তিনি সাধুবাদ পেতেই পারেন। কিন্তু সুপারিশটি সঠিক হয়নি। আমার জানা মতে, কলা অনুষদেই মিডিয়া স্টাডিজে লন্ডন থেকে পিএইচডি করা অধ্যাপকও রয়েছেন। প্রয়োজনে তাকে সাময়িকভাবে বিভাগটি গড়ার দায়িত্ব দেয়া যায়। তবে অবশ্যই অতি দ্রুত এ বিভাগে সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপক নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন। নতুবা শুরুতেই বিভাগটি মুখথুবড়ে পড়বে। ~~অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন শিক্ষক-ব্যক্তি।~~ তিনি জানেন একটি বিভাগ কিভাবে দাঁড় করাতে হয়। ষষ্ঠত, এই সুপারিশটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাকে একটি প্রশ্নের মুখে ফেলে দিতে পারে। একজন ভিসিকে যে কত চাপের মুখে কাজ করতে হয়, এটা তার বড় প্রমাণ। আমার ধারণা ছিল অধ্যাপক হোসেন কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী হবেন। অনেক আশার কথা তিনি আমাদের শুনিয়েছেন। আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। একজন মুক্তিযোদ্ধা কেন 'চাপে'র কাছে মাথানত করবেন? তিনি কেন দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলেন না? আগামীতে তার ওপর আরও চাপ আসবে। প্রো-ভিসির টার্ম শেষ, ট্রেজারারের টার্মও শেষ হয়ে আসছে। নতুন যারাই আসবেন, তাদের অবশ্যম্ভাবীভাবেই জাহাঙ্গীরনগরের শিক্ষক হতে হবে। যে কোন একটি ভুল 'চয়েস' নতুন আরও অনেক সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। যতটুকু, শেষ পর্যন্ত ভিসি মহোদয় ওই সুপারিশটি সিন্ডিকেটে তোলেননি। এজন্য তিনি ধন্যবাদার্হ। এখন খোদ ড. জাহাঙ্গীরই পারেন সব বিতর্কের অবসান ঘটাতে। তিনি যদি তার প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে নেন, তিনি নিজেও ধন্যবাদের পাত্র হবেন। ভিসি মহোদয়কেও বিতর্কের হাত থেকে বাঁচাবেন। তিনি যদি 'গোঁ' ধরে থাকেন, আমার বিশ্বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায়ের কাছে তিনি গ্রহণযোগ্য হবেন না। এতে করে বিতর্কের মাত্রা আরও বেড়ে যাবে।

সব পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ড নিয়ে আমাকে একটি বড় ধরনের হতাশায় পেয়ে বসেছে। একজন উপাচার্য কিভাবে বিতর্কের জালে জড়িয়ে যান, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা তার বড় প্রমাণ। পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন উপাচার্যকে নিয়ে একের পর এক যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে, তাতে করে এই পদটির প্রতি আমি আর আস্থা রাখতে পারছি না। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নতুন ওই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছেন। নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের কোন 'ভিশন' নেই। আগামী শতকে কেমন গ্রাজুয়েট আমরা চাই, তার রূপকল্প তাদের জানা নেই। দলীয় বিবেচনায় নিয়োগপ্রাপ্ত শিক্ষকদের নিয়ে নানা প্রশ্ন সংবাদপত্রেই ছাপা হচ্ছে। একটা ভয় আমার মাঝে কাজ করে— কারা আগামী দিনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর নেতৃত্ব দেবেন? এভাবে যদি চলতে থাকে, তাহলে সেদিন খুব বেশি দূরে নয় যেদিন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়েরও অনেক পেছনে পড়ে যাবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো। অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় চলছে স্থানের থেকে অবসরে যাওয়া

অযোগ্য শিক্ষকদের ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে, আর ভিসিরা দায়িত্ব পেয়েই প্রথম যে কাজটি করছেন, তা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে পারিবারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। শিক্ষকের স্ত্রী, ভাই, ছেলে, মেয়ে, মেয়ের জামাই শিক্ষক হচ্ছেন, তাদের সন্তানরা শিক্ষক হচ্ছেন। ভিসির দায়িত্ব ছেড়ে বিভাগীয় প্রধান ও ডিন হচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটাই— নিজের সন্তানকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া। এ প্রবণতা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে কোথায় নিয়ে যাবে, আমরা তা জানি না।